ছাত্রসমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী স্মরণানন্দ

বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শূন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য বিবদমান নানা মতাদর্শের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলছে। অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের, আর তার প্রত্যুত্তরও তারা দিয়েছে, বিদ্রোহও করেছে।

এই বদলাতে-থাকা সময়ে ছাত্রসমাজকে ভাল, মন্দ ও উভয়-নিরপেক্ষ সবরকম প্রভাবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা তাদের সমস্যার উত্তর খুঁজছে। যে-শিক্ষা ছাত্রকে পরবর্তী কালে একমুঠো অন্ন জোগাতে পারে না, তার কাছে সেই শিক্ষার কী মূল্য আছে? জীবনের এক-চতুর্থাংশ যে সে ব্যয় করছে শিক্ষালাভের জন্য, তা কি এক কানাগলির শেষে কিংবা এক গভীর খাদের কিনারায় পৌঁছবার জন্য? সে দেখতে চায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরবর্তী পথের হদিশ। আর তা না পেয়ে, সে এক খাঁচায় বন্দি হিংস্র জন্তুর মতোই প্রতিবাদ জানায়—যে বেরোবার পথ না পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে ভ্রূকুটি করে আর গর্জন করে। হয় পূর্বজরা তাদের পথ দেখিয়ে দিক, নয়তো তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য পথ খুঁজে নেবে—কঠিন পথ।

এই বিষয়ে বহু মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অতীতের সবকিছু সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে। অন্যেরা কোনও রাজনৈতিক বলির পাঁঠা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এবং তার উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দেন। অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে, একটি শিশু সেটাই হয়ে ওঠে—তার পরিবেশ তাকে যেভাবে তৈরি করে। ছাত্ররা সমাজব্যবস্থার ফসল। আজকের যুগে, যখন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও চিন্তাস্রোতের এক বিরাট আদানপ্রদান প্রতিনিয়ত সমস্ত বিভেদ মুছে ফেলছে, ক্রমশ ছোট হয়ে-আসা সেই বিশ্বে চাইলেও আমরা আমাদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি না। সাংস্কৃতিক মিলনের এই কালস্রোতে ভাসমান ছাত্রদল স্থির করে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। তারা কী চায়, অনেক সময় নিজেরাই সে-সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু তাদের ঘিরে-থাকা এই ডামাডোলের মাঝে এক গভীর অসন্তোষ থেকে

পরমপূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। তাঁর 'Musings of a Monk' গ্রন্থ থেকে 'The Student and Swami Vivekananda' প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন সুমনা সাহা।

তারা একটি নতুন পথ বের করবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই প্রচেষ্টায় কেউ কেউ সবচেয়ে আধুনিক ও মানবতাবাদী আদর্শ গ্রহণ করে। অন্যেরা পরিস্থিতি-প্রবাহে ভেসে গিয়ে যেকোনও তীরে ভিড়বার অপেক্ষায় নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকে।

এই বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ মনে একটি প্রশ্ন জাগে—অতীত ভারতের কি দেওয়ার মতো কিছুই নেই? সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোনও পথনির্দেশিকা কি নেই? এই পারমাণবিক শক্তিধর যুগের সঙ্গে সেযুগের কি একেবারেই কোনও সম্বন্ধ নেই? আমরা দেখি, এই প্রশ্নগুলির উত্তর সহজেই দেওয়া যায়, যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাণবন্ত গতি ও যুবসমাজের জন্য ভাবনা। তাঁর জীবন আমাদের জোগাতে পারে জীবনের সেই সঞ্জীবনী সুধা, যা যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করবে। জীবদ্দশায় তিনি প্রবীণ গোষ্ঠীর সমালোচনার পাত্র হলেও সর্বদাই যুবকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী যুবক, তাঁর সময়কালে পরম্পরাক্রমে চলে আসা বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন বিদ্রোহী, কখনও বুড়িয়ে যাননি।

তাঁর কয়েকটি উপদেশ বিচার করে দেখা যেতে পারে, যেগুলি বিশেষত তরুণদের কথা ভেবেই বলা। বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে স্বামীজী সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন শিক্ষার কাজ হল মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা। তাই তিনি বলেছিলেন, ‘‘যে-বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা।’’ কিন্তু তার উপায় কী? শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা?

তার আগে পর্যন্ত কি আমরা ‘‘বর্তমান প্রজন্মের জীবন ব্যর্থ হয় হোক, আমরা পরবর্তী প্রজন্মের যত্ন নেব’’—একথা বলে ঘটমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেব? আমাদের যেটা করা উচিত তা হল, কয়েকটি বিশেষ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক কিছু পথের সন্ধান করা, যাতে করে যুববৃন্দ তাদের চরিত্র গঠন করতে পারে এবং নিজেদের সমাজের উপযোগী সদস্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। স্বামীজী বলতেন, ‘‘যাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—এইরকম শিক্ষা চাই।’’

জীবন সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে জীবনের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। ‘ভাগ্যে যা আছে তাই হবে’—এমন একটি সুখী জীবনদর্শন ছাত্রসমাজকে কোনও লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না, বরং প্রায়ই দেখা যায়, এই মনোভাব তাকে বাস্তবের কঠিন ভূমিতে আছড়ে ফেলে। সুতরাং জীবনের একটি পর্যায়ে এসে জীবনকে বুঝে নিতে আরম্ভ করবার জন্য গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘‘আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করছে—সব কিছু হেসে উড়িয়ে দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যা কিছু সব আসবেই আসবে।’’

বর্তমান যুগে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা নিয়ে ছাত্রসমাজ প্রশ্ন তুলেছে। স্বামীজীর মতে, এই প্রশ্ন অযৌক্তিক, কারণ মানবতার পথে সমাজ কেবল একটি অধ্যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ চিরন্তন। তিনি বলেছেন, ‘‘সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোনও সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই

সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হোক। সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হবে; সত্য কখনও সমাজের সঙ্গে আপস করবে না।"

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্ম-চরিতার্থতা। কেবলমাত্র নিঃস্বার্থতার মাধ্যমেই তা লাভ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "আর কিছুরই আবশ্যক নেই, আবশ্যক কেবল প্রেম সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—এটিই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকতেও তা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যু-স্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ-কথাও যদি কেউ বলে, তবুও তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।"

বর্তমানে ছাত্ররা যখন তাদের জীবনের অর্থ খুঁজছে, এমন কর্মপরিসর খুঁজছে যাতে করে তাদের চরিত্রবল বৃদ্ধি পায় এবং তারা দেশের উপযোগী নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের এই কর্মে প্রযুক্ত বেদান্তের বাণী, যা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরদর্শনের কথা বলে, তার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সাম্যবাদের ভিত্তি যে-মানবতাবাদ, তারও দাঁড়াবার জন্য একটি আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োজন। অবশ্যই এমন অনেকে আছেন যাঁরা যুক্তি খাড়া করবেন যে, বহু দ্বন্দ্ব ও বিবাদের শেষে ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য ধারা সকল বিরোধ নিঃশেষে পায়ে দলে সাম্য এনে দেবে। তাঁরা হয়তো বলবেন, মানবতাবাদ একটি দুর্বল ধারণা, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

এই আবশ্যিক পরিবর্তন আনার জন্য ভারতবর্ষে প্রাচীনকালের ঋষিরা মানবতাবাদী তত্ত্ব বা ইতিহাসের দ্বন্দ্বময়তার তুলনায় একটি উন্নততর উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। সম্পদের তৃষ্ণা ত্যাগের, আত্মোৎসর্গের একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্বম্" (ঈশোপনিষদ, ১)—এই সমস্তই দিব্য ভাব দ্বারা আচ্ছাদিত করো। প্রত্যেক প্রাণীর অন্তর্নিহিত দিব্যচেতনা কেবল একটি তত্ত্ব হিসেবেই গ্রহণীয় ছিল না—এটি একটি সত্য যা হৃদয়ঙ্গম করা এবং আমাদের সমস্ত কর্ম এই ভাবের অভিমুখী করে তোলা কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সকল মানবতাবাদী গোষ্ঠী এবং পরবর্তী কালেও যারা আসবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবলম্বন হবে সকল বস্তুর দেবত্বজ্ঞাপক এই একটিমাত্র তত্ত্ব। অতএব ধনে লোভ কোরো না, ত্যাগের মাধ্যমে জগতের আনন্দ উপভোগ করো।

যাদের ত্যাগ করবার মতো ধন নেই, কোনও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছাড়া অপরকে সেবা করবার জন্য এগিয়ে এসে তারাও সুখী হতে পারে। এই উপায়ে ভাবী প্রজন্ম জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড় সমূলে ছিন্ন না করে পরিবর্তিত সময়ের উপযোগী সমস্যার

সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষাবিদের এটি মনে রাখা উচিত এবং ঘরে ঘরে ছাত্রদের এটি বোধ করানো ও এই ভাবের অনুশীলন করানো কর্তব্য।

এই সূত্রে একটি কর্মসূচির পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যাতে করে ছাত্ররা নিজেদের সমাজ-সেবক দল হিসেবে সংগঠিত করতে পারে এবং সর্বত্র, বিশেষত গ্রামে কাজ শুরু করতে পারে। এই সমাজ-সেবক গোষ্ঠীগুলিকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উচ্চ আদর্শের নিষ্ঠাবান বাহক হতে হবে। এই আদর্শগুলিকে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে বুঝেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন, আর কেউ ততটা করতে পারেননি। তরুণ প্রজন্মকে স্বদেশবাসীর জন্য প্রকৃত দরদি ভাবনা ভাবতে ও সেই ভাবনাকে একটি বাস্তবোচিত আকার দিতে শেখাতে হবে—অনুশীলন ও অনুভবের মাধ্যমে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যুবসমাজের শিক্ষার জন্য গৃহীত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে—

১। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা। ছাত্ররা নিজেরাই এই ক্লাস পরিচালনা করবে। যেমন, কলেজের ছাত্ররা স্কুলের ছাত্রদের পড়াতে পারে।

২। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র।

৩। কৃষিকাজের আধুনিক কৌশল শিক্ষা করতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং গ্রামের মানুষকে এই কৌশলগুলি শিখিয়ে দেওয়া।

৪। বস্তি সাফাই অভিযান এবং বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দেওয়া।

৫। জনগণকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা।

৬। বিপ্লবের আদর্শকে নতুন পথে, অন্তরের বিপ্লবের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়।

৭। ছোট শিশুদের সঙ্ঘবদ্ধ করে পরিচ্ছন্নতা, গান, খেলাধুলো, সমাজ-সচেতনতার শিক্ষা দিতে হবে।

ছাত্ররা নিজেরাই এইসমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করবে। বড়রা তাদের দূর থেকে সাহায্য করতে পারে। স্বামীজীর শেখানো এই উদার নীতিগুলি যদি ছাত্রদের মাধ্যমেই ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়া যায়, তারা অপরের জন্য কাজ করবার প্রয়োজনীয় প্রেরণা লাভ করবে এবং সেই কাজের মধ্যে আনন্দও খুঁজে পাবে। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে তারা একটি সার্থকতার ভাবও লাভ করবে। এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে অপরের জন্য কাজ করতে করতে ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।